মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির মুখপত্র
Mouthpiece of Murshidabad Heritage & Cultural Development Society

ITIHASER ALINDE

মূল্য : ৫ টাকা ১ ম বর্ষ- ২ সংখ্যা ❐ ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ সন (ইং- ১৮ মে ২০১৯) শনিবার, ❐ আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবস (International Museum Day) ত্রৈমাসিক ৪ পাতা (Quarterly- 4 P.)

১৮ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। তার শুভারম্ভ -এর মহূর্ত।

ফৌতি মসজিদ অধিগ্রহণ করার দাবী

স্বপন কুমার ভট্টাচার্য

বাংলার নবাব ছিলেন সারফরাজ খাঁ। একাধারে মুর্শিদাবাদের স্থপতি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ নাতি আর নবাবা সুজাউদ্দিন পুত্র, যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিরিয়ায় প্রথম শহীদ। সারফরাজ খাঁর অসম্পূর্ণ কীর্তির মধ্যে ফৌতি মসজিদ একটি অনন্য সৌধ। মুর্শিদকুলি খাঁর নির্দেশে নির্মিত কাটরা মসজিদের আদলে তৈরী করার উদ্যোগী পুরুষ ১৭৪১ খ্রীঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করলে ফৌতি মসজিদ নির্মাণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তী কালে আলীবর্দ্দী খাঁ নবাব হবার পর সারফরাজ খানের পরিবারের দায়িত্ব নিলেও ফৌতি মসজিদের দিকে ফিরিয়েও তাকাননি। এই মসজিদটি ১৩৫ ফুট লম্বা ও ৩৮ ফুট চওড়া। মসজিদ এখন জীর্ণ অবস্থায় বর্তমান। অপূর্ব তার গঠণ শৈলী কিন্তু পুরাতত্ত্ব দপ্তর এখন পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব না নেওয়ার কারণে মসজিদটি দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। হেরিটেজের পক্ষ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সহ জেলা প্রশাসনকে কয়েকবার মসজিদটি অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে পত্রালাভ করলেও সবাই দেখছি উদাসীন। আমরা চাই অবিলম্বে ফৌতি মসজিদকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দপ্তর অধিগ্রহণ করুন। সেই সাথে একটি ঐতিহাসিক সৌধ রক্ষা করে জেলার ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন কেননা এটা জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী।

১৮ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে আয়োজিত শোভাযাত্রার কিছু বিশেষ মুহূর্ত।

হাজারদুয়ারীতে তীব্র জলের সংকটে পর্যটকরা নাজেহাল —

ডা: সিদ্ধার্থ ঘোষ

নবাব হুমায়ুন জাঁর সাধের বড়াকুঠি, বর্ত্তমান নাম হাজারদুয়ারী প্যালেস মিউজিয়াম। দেশের অন্যতম একটি সংগ্রহশালা। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ হাজারদুয়ারীকে অধিগ্রহণ করার পর অনেকটাই তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক হাজারদুয়ারী দেখার জন্য আসেন। কিন্তু পর্যটকদের পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে হাজারদুয়ারী কর্তৃপক্ষের অনেক গাফিলতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গোটা হাজারদুয়ারী প্রাঙ্গণে বছরের পর বছর পানীয় জলের সংকটের ফলে পর্যটকরা পাণীয় জলে অভাবের ফলের তৃষ্ণা নিবারণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উল্লেখ্য : হাজারদুয়ারী সিঁড়ির নীচে কিছুদিনের জন্য ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানে কয়েকবছর থেকে সেটিও বিকল হয়ে পড়ে আছে। ভি আই পি গেট ও হলুদ মসজিদের সম্মুখে অতি নিম্নমানের পানীয় জলে ট্যাঙ্ক থাকলেও তা পানের যোগ্য না।। যেমন গত বছর ঈদের পর তীব্র দাবদাহের মধ্যে হাজার হাজার পর্যটকরা হাজারদুয়ারী দর্শনে এসে তৃষ্ণা মোচনের জন্য হাজারদুয়ারী এলাকায় পানীয় জল না থাকার কারণে অনেক পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। এমন কি হাজারদুয়ারী চত্বরে পানীয় জলের বোতল চড়া দামে বিক্রি করতে দেখা গিয়েছিল। এ বছরও তীব্র দাবদাহের মধ্যেই ঈদ পালিত হবে সেই সাথে হাজার দুয়ারী ভ্রমণে হাজার হাজার পর্যটকদের ঢল নামবে। তাই গত

বছরের মত পাণীয় জলের সংকট পুনরায় হাজারদুয়ারী প্রাঙ্গণে পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু পুরাতত্ত্ব দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত সার্কেল বিভাগ এ ব্যাপারে নির্বিকার। তাঁদের কোন হেলদোল নেই। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক পাণীয় জল ও মহিলা, পুরুষদের জন্য শৌচাগার ও শৌচালয় নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, পানীয় জলের জন্য অতি নিম্নমানের কয়েকটি ট্যাপকল হাজারদুয়ারী এলাকায় প্রায় এক বছরের অধিক কাল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাতে আজ পর্য্যন্ত জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি। তাতে প্রশ্ন থেকে যায়, কি উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ সরকারী টাকা অপচয় হচ্ছে। সার্কেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার শ্রী ঋজু ঘোষকে এ বিষয়ে বহুবার আবেদন জানানো হলেও তাঁর কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই এলাকাবাসীর একটাই প্রশ্ন পরিষেবা দেবার নাম লক্ষ লক্ষ সরকারী টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে এর সঠিক উত্তর কি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষনের কোলকাতা সার্কেলের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

তাই হাজারদুয়ারী এলাকায় অবিলম্বে পানীয় জল, শৌচাগার ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে পর্যটকদের পরিষেবা দিতে হোন ভারপ্রাপ্ত সার্কেল বিভাগ উদ্যোগী হোন।

খেরুর অভিযান

পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩.০৩.২০১৯ অজানা ইতিহাসের খোঁজে আমরা মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সদস্যরা ঐতিহাসিক খেরুর মসজিদে ভ্রমনে গিয়ে মসজিদের বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এলাম। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেনশাহ এর আমলে তৈরী টেরাকোটা ও পাথরের পিলার সমৃদ্ধ প্রাচীন এই খেরুর মসজিদ ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে এবং ভারতবর্ষের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন বহু পর্যটক মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত খেরুর গ্রামের এই ঐতিহাসিক মসজিদটি দর্শন করতে আসেন। মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে রাজ্য প্রশাসন এই ঐতিহাসিক স্থানের প্রবেশ পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় আর্কিওলজিক্যাল দপ্তরের অফিস থাকা সত্ত্বেও এবং বার বার তাদের কাছে আবেদন করা হলেও (বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পের ফলে ঐতিহাসিক মসজিদটির যথেষ্ট ক্ষতি হয় বিশেষ করে সম্মুখের দিকে ।) দপ্তরটি কোনরূপ সহযোগিতা করছে না। আমাদের সোসাইটির সম্পাদক স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য বেশ কয়েকবার দপ্তরে চিঠি লিখে আবেদন করলেও গত একবছর পূর্বে বাউণ্ডারী এলাকা ঘিরে দেবার জন্য গর্ত করা হয়, পুরোনো লোহার এঙ্গেল ও তারের বেড়া সরিয়ে কোন অজানা কারনে এক বছরের অধিক সময় কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে গভ: সংরক্ষিত এলাকায় সব সময় গরু ছাগল ও কুকুর বিচরণ করছে। মসজিদটির উত্তর দিকে পুকুর থাকায় পাড় ভেঙে মসজিদটির দিকে এগিয়ে আসছে। মসজিদের বেশ কয়েক

৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

বহরমপুরের

সম্পাদকীয়

হেরিটেজ কথার অর্থ হল ঐতিহ্য। বিশ্বব্যাপী ১৮ই এপ্রিল আর্ন্তজাতিক ঐতিহ্য দিবস পালন করা হয়। সারা বিশ্বে মোট ১০৫২ টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী সাইট আছে। তার মধ্যে ৮১৪ টি সাংস্কৃতিক ২০৩টি প্রাকৃতিক এবং ৩৫ টি মিশ্র। বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ঐতিহ্য মণ্ডিত স্থানগুলির সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে থাকে। বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হল সেটাই যা প্রাকৃতিক মানব-নির্মিত কোন এলাকা বা কাঠামো বা স্থান, যার বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন। ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলির সংরক্ষণ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটে। ঐতিহ্য ভবনগুলি এক সাথে সেই এলাকার রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা সমূহকে তুলে ধরে। তাই কোন স্থানকে জানতে গেলে সেই এলাকার ঐতিহ্য মণ্ডিত ভবন স্থাপত্য, ভাস্কর্যকে ভালো করে জানা খুব প্রয়োজন। আর তাই প্রয়োজন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবন স্থাপত্য কাঠামোগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষন করা আর এরজন্য প্রয়োজন মানুষকে শিক্ষিত করা, ঐতিহ্য সম্পর্কে আকর্ষণ বাড়ানো, ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সঠিক আইন প্রণয়ন করা এবং মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমাদের দেশে মোট ৩৬ টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী সাইট আছে। তার মধ্যে ২৯ টি সাংস্কৃতিক, ৭টি প্রাকৃতিক। এক কালের বাংলা, বিহারা, ওড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আজ অবহেলিত। পুরনো ঐতিহাসিক ইমারত গুলির অবস্থা খুব একটা ভালো না। আর সেই অবহেলিত ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি যা সরকারী ভাবে ২০০৭ সালে ঘোষিত হয়। বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালন করার সাথে সাথে নজর দিতে হবে জেলার ঐতিহ্যশালী ইমারতগুলির সঠিক সংরক্ষণ যাতে এগুলির ঠিকঠাক দেখাশোনা করা হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

মীরজাফরের অষ্টম বংশধর ডঃ সৈয়দ রেজা আলী খান জাফর মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ সংগঠনের বর্তমান সভাপতি। ২০১৬ সালে গর্ভমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল উর্দু অ্যাকাডেমী তাঁর থিসিসকে বেষ্ট থিসিস অব দি ইয়ার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করে। তাঁর সঙ্গে আজ এক ঘরোয়া আলোচনায় উঠে এলো তাঁর পরিবার, জীবন, হেটিরেজ সংস্থা সম্পর্কে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা।

— সাক্ষাৎকার নিলেন সহেলী চক্রবর্তী

প্রশ্ন : আপনার বংশ পরিচয় একটু বলুন আমাদের।

জাফরু নবাব : মীরজাফরের দাদু ইরাকের নাজাফ প্রদেশ থেকে মুঘল আমলে ভারতে আসেন। মীরজাফর পিতার দিক থেকে ছিলেন হজরত মহম্মদের বংশীয়। অন্যদিকে মায়ের দিক থেকে মুঘলশাহজাদা দারা শিকোহর নাতি। আমি সেই মীরজাফরের অষ্টম উত্তরপুরুষ।

প্রশ্ন : মীরজাফরের প্রথম বেগম শাহখানমের বংশধর যেহেতু আপনারা, সেই অনুযায়ী মীরজাফরের পর বাংলার নবাব আপনাদের পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সেরকম হলনা। কেন?

জাফরু নবাব : মীরজাফরের প্রথম বেগম শাহখানমের পুত্র মীরণ ছিলেন প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী। ব্রিটিশরা কোনদিন চায়নি ব্রিটিশ বিরোধী কাউকে বাংলার তখতে বসাতে। তাই মীরণের আকস্মাৎ মৃত্যুর পর তারা মীরনের ছেলেকে উত্তরাধিকার দেয়নি এই ভয়ে যে, আবার তাদের বিদ্রোহের মুখে পড়তে হবে ও তাদের ক্ষমতা দখলে পরিবর্তন আসতে পারে। তাই মীরণের বংশধর হওয়ার কারণে আমাদের বংশ উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বঞ্চিতই থেকে যায়।

প্রশ্ন : নবাবের প্রথম বেগমের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের কি নিজের বঞ্চিত মনে হয়?

জাফরু নবাব : অবশ্যই আমরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করি, মীরণের বংশধর হওয়ার কারণে আমরা কোনদিন প্রাপ্য অধিকার পাইনি। নবাবী দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন : এরকম শোনা যায় যে বাংলার বাব্বু বেগমের বংশধর যাঁরা নবাব হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই আপনাদের পরিবারকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। এখনও কি সেই গুরুত্ব বর্তমান?

জাফরু নবাব : হ্যাঁ, একটা সময় আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। সময় পাল্টেছে, যুগও পাল্টেছে। তবে হা গুরুত্ব অনেকাংশে একই আছে।

প্রশ্ন : মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব ওয়ারেশ আলী মীর্জার সাথে আপনার কোন স্মৃতি থাকলে সেটা একটু বলুন।

জাফরু নবাব : খুব সাধারণ মানুষের মত তাঁর আচরণ ছিল। সবার সাথে মিশতে ভালোবাসতেন। ভালো ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কলকাতায় পড়াশোনা করা চলাকালীন তাঁর সংস্পর্শে থাকাকালীন তাঁর যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছি। আমাদের বংশকে সম্মান করতেন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার রক্তে মীরজাফর এবং আলিবর্দীর রক্ত বইছে। সেই হিসাবে আপনার বংশের বর্তমান প্রজন্মের মাঝে আপনার আবেদন ও অভিজ্ঞতা কেমন?

জাফরু নবাব : তারা এখন এসব থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম তার ইতিহাস। নবাবী আনাতে আগ্রহ দেখায় না।

প্রশ্ন : সাধারণ মুর্শিদাবাদের জনগণের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন? নতুন প্রজন্মে আপনাদের এখন কিভাবে দেখে?

জাফরু নবাব : এখনও যেসব প্রচীন মানুষ আছেন তাঁরা আজও সম্মানের চোখে দেখে নবাব পরিবারকে। কিন্তু যারা নতুন তারা যেহেতু ইতিহাস সচেতন নয় তাই সেইভাবে তাদের মধ্যে সম্মান প্রদর্শনে কিছু অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন : হেরিটেজ সংস্থার সাথে কবে যুক্ত হলেন? আপনার মতামত কি হেরিটেজ সংস্থা সম্পর্কে?

জাফরু নবাব : মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য একসময় জেলা ছাড়িয়ে বাংলা, বিহার, ওড়িশাতেও ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু পরে তা ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশের মাটির প্রতি টান, এবং জেলার ইতিহাস রক্ষা করা একটা ইচ্ছা প্রথম থেকেই মনের মধ্যে ছিল তাই যখন স্বপন কুমার ভট্টাচার্য হেরিটেজ সোসাইটির মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষনের চেষ্টায় ব্রতী হন তখন আমিও তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ জেলার ইতিহাসকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসা এবং সহযোগিতা করা। যাতে জেলার প্রাচীন স্থাপত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি যাবতীয় প্রতিকূলতাকে বিজয় করে টিকে থাকে।

ধন্যবাদ ডঃ সৈয়দ রেজা আলী খান জাফর মহাশয় আমাদের আপনার মূল্যবান বক্তব্য জানানোর জন্য।

‘সন্ন্যাসীতলা’ শতবর্ষের একটি প্রাচীন দেবালয়

কুণাল কান্তি দে

জেলা মুর্শিদাবাদ সদর শহর বহরমপুর। এই শহরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রপ্রস্থ। কর্মচঞ্চল নতুন বসতি। জল জঙ্গল, জমি সাফ করে গড়ে উঠেছে লোকালয়। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বড় বড় অট্টালিকা। শহরের পরিকাঠামোয় রূপ পেয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর মূর্ত্তির প্রধান সড়ক ধরে লিপিকা বালিকা বিদ্যালয় যেতে রাস্তার ডানদিকে সরু পথ বেয়ে একটু যেতেই লোকালয়ের মধ্যে মন্দির। ০.৫ কাঠা জায়গা হিন্দু সর্বসাধারণের দেবকার্য হিসেবে সরকারী নথিপত্রে চিহ্নিত রয়েছে। ভক্তপ্রাণ নর-নারীরা আসা যাওয়ার পথে মাথা নীচু করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনেকেই মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট হয়ে সাধন ভজন করেন। মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সাময়িক মনটাকে শান্ত ভক্তিচিত্তে নিজেকে শুদ্ধ করার লক্ষ্যে সমাহিত করেন। মন্দিরটি সাধারণের কাছে ‘সন্ন্যাসী তলা’ নামে অভিহিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। মন্দির অভ্যন্তরের বেদীতে আছেন ‘রাধা গোবিন্দ’ এবং ‘নিতাই গৌরাঙ্গ’ -এর বিগ্রহ। অন্যদিকে মন্দিরের মধ্যে কালো পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী কালি মূর্তি। সকাল সন্ধ্যা বিগ্রহের সেবা করেন নিষ্ঠাবান পুরোহিত তপন ব্যানার্জী। সমগ্র মন্দিরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে আছেন অন্য একজন। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে সমাধির মত বাঁধানো একটি বেদী রয়েছে। বেদীর পাশে ছোট্ট ঘরটিতে দেবাদিদেব মহাদেবের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। শাক্ত, বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্মালম্বীদের সহাবস্থান। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের এক মিলন ক্ষেত্র। সব মত মিলছে একই পথে। এক অভূতপূর্ব নিদর্শন।

মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে একটি পরিচালন সমিতি। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নতুন কমিটি গঠিত হয়। মন্দিরের সামগ্রিক উন্নয়ন কমিটির সদস্যরাই চিন্তা ভাবনা করেন। প্রায় দুই শত ভক্ত এই কমিটির অন্তর্ভূক্ত সদস্য। ভক্তজনের দানে গড়ে উঠেছে বর্তমান মন্দিরটি। এগিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষও। মন্দিরের অভ্যন্তরে পূজাচর্চনা, গীতা পাঠ ও কথামৃত পাঠ করা হয়। কি শনিবার শনি ঠাকুরের পূজার ব্যবস্থাও রয়েছে, নামমাত্র দানে বিশেষ বিশেষ দিনে দুপুরে প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। চাকুরী জিবি, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী স্থানীয় ব্যবসাদারেরাও এই পরিচালন সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। পরিচালন সমিতির প্রতিটি সদস্য নির্দিষ্ট পরিমান মাসিক চাঁদা দেন। ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা প্রতি মাসে বিভিন্ন খাতে খরচ হয়। সভ্যদের মাসিক চাঁদা থেকে এই খরচ করা হয়। সদস্যদের কাছ থেকে গৃহীত অর্থ পর্যাপ্ত নয়। এই আক্ষেপ ঝরে পড়ল মন্দিরের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শিব নারায়ন বসাকের গলায়। তাঁর মতে এলাকার সব গৃহ কর্ত্তাই যদি নিয়মিত সাধ্যমত নিয়মিত দান করেন এবং বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রবাল মুনসীর গলায়ও একই সুর। অনতিবিলম্বে মন্দিরের সামনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি নাটমন্দির তৈরীর পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বর্তমান কমিটির বিশেষ ভাবে যুক্ত ও তৎপর। এলাকার উৎসাহী নর-নারীর ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং সাধ্যমত দানেই এই নাটমন্দির তৈরী সম্ভব। নাটমন্দির তৈরী হলে বহু ভক্ত একসঙ্গে বসে নামসংকীর্ত্তণ শুনতে পাবেন। বিভিন্ন সময়ে ধর্ম আলোচনা, বেদ পাঠ, গীতা পাঠ, নর-নারায়ণ সেবা ইত্যাদি সুন্দর সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এসে প্রায় সকলেই তৃপ্ত হন এবং মানসিক শান্তি খুঁজে পান। অদ্ভুত এক মোহময় পরিবেশ মন্দিরের অভ্যন্তরে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তী রয়েছে, আছে কিছু জনশ্রুতিও। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে অদ্ভুত এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। বহুদূর থেকে অসংখ্য নর-নারী মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং বিগ্রহ দর্শন করে তৃপ্ত হন। বারো মাস পূজা হলেও মাঘ মাসের সংক্রান্তির তিথিতে বিশেষ উৎসবে মেতে উঠেন। সমস্ত সম্প্রদায়ে ভক্তগণ। শাক্ত, বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দের পদধূলিতে মুখরিত হয় সন্ন্যাসীতলা প্রাঙ্গণ। ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন সংযোগে নগর পরিক্রমা, মহোৎসব এবং অষ্টপ্রহ কখনও বা চব্বিশ প্রহর নাম সংকীর্ত্তন। মহাসমারোহে বাৎসরিক উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

সন্ন্যাসীতলা। কে এই সন্ন্যাসী? কি তাঁর নাম? কোথা থেকে এসেছিলেন? কোথায় কবে দেহ রেখেছেন এই রকম অসংখ্য ভক্তের কৌতুহলের শেষ নাই। এই মন্দিরের প্রথমাবস্থা কেমন ছিল এই নিয়ে লোক মুখে জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তী ছিটিয়ে রয়েছে এই এলাকার পথে প্রান্তরে।

বর্তমান নাম ইন্দ্রপ্রস্থ হলেও এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান কেমন ছিল অনেক গ্রামীণ প্রবীন মানুষের সংস্পর্শে এসে জানা গেল দূর অতীতের কিছু কথা।

শৈলেন্দ্রনাথ ধর। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মী। ৭৩ বছর হলেও স্মৃতিশক্তি প্রবল। একটু একটু করে দূর অতীতের ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন আমাদের সামনে। ১০ বছর বয়সে পিতৃদেব ললিত কুমার ধর মহাশয়ের হাত ধরে অনেকের সঙ্গে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় উঠেছিলেন বহরমপুরে। ১০ বছরের বালক। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে যেন তর্পণ করেছিলেন শ্রাবণের প্রত্যুষে মন্দির সংলগ্ন নিজস্ব বাড়ীতে বসে। প্রশ্নকর্তা ছিলেন এই এলাকারই একজন বরিষ্ঠ নাগরিক। পেশায় ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিক হলেও পেশায় সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব, সনৎ কুমার মণ্ডল। শ্রোতার আসনে তখন এই প্রতিবেদক লেখক।

ধর মহাশয় শুরু করেছেন অতীত দিনের কথা। ১৯৪৮-৪৯ সালে পিতৃদেবসহ ওপার বাংলার বড়িশাল জেলার বেশী কিছু ছিন্নমূল মানুষ এই এলাকায় এসে সবে বসবাস শুরু করেছেন। চারিদিকে জল, জঙ্গল, চাষের জমি বড় বড় গাছ। কাঁচা রাস্তা ‘আল’ পথে।

জঙ্গলের মধ্যে অদ্ভুত এক অশ্বত্থ গাছ যার শিকড় থেকে গুঁড়ি ও কাণ্ডের অনেকখানি অংশ শায়িত আছে এবং গাছের পরবর্ত্তী কাণ্ডের থেকে ডালপালা শাখা বিস্তার করেছে। দূর থেকে দেখলে শায়িত কোনো মানুষ বলে ভ্রম হতে পারে। এলাকারটি সীমা ১২ বিঘা। জঙ্গল ও জমির মালিক ছিলেন কাশিমাবাজারের ছোট রাজা কমলা রঞ্জন রায়। কাশিমবাজার মাহালের একটি অংশ ছিল অনুমান কোনো এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী

চলবে-

বোরাকুলির মাটিতে ইতিহাসের গন্ধ

মুরসালিম সেখ

‘মহামানবের পদধুলি আর তামা-কড়ি ও মড়ার খুলি, টুকরো এসব হিস্ট্রি বুকে চুপটি আছে বোরাকুলি’...

হ্যাঁ, ঠিক তাই! মহামানবের পায়ের ধুলো, মরচে পড়া তামা, কড়ি এবং মড়ার হাড়গোড় ও মাথার খুলি এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসের বেশ কিছু চিহ্ন ও উপাদান আর ইতিহাসের রহস্যময় রোমাঞ্চকর গন্ধটা বুকে ধারণ করে চুপটি করে আছে গ্রাম বোরাকুলি। যাকে দেখলে চট করে বোঝাই যাবে না, এই গ্রামের ঘাস, বাঁশ, আম-কাঁঠাল বা পিটুলির জঙ্গলে ভরা মাটিতে মিশে রয়েছে এমন কিছু, যেগুলো আমাদের জন্য হতে পারে পুরনো দিনের দর্পণ!

মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানার টেংকারায়পুর-বালুমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গতি প্রত্যন্ত একটি গ্রাম বোরাকুলি। আমি এই গ্রামেরই একজন ছেলে হিসেবে অনেক মানুষের মুখে গ্রামটির সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা শুনে আসছি। দেখে আসছি বেশ কিছু নিদর্শন। বোরাকুলি হিন্দুপাড়ায় হিন্দুদের যে মন্দিরটি এখন রয়েছে, শোনা যায় সেখানে বৈষ্ণবদের একটি পীঠ ছিল। এই পীঠে একবার শ্রীচৈন্যদেব এসেছিলেন এবং একটি রাত্রিও যাপন করে গেছেন। কারো কারো মতো, শ্রীচৈতন্য নন। তাঁর প্রিয়তম পাঁচজন শিষ্য যাঁদেরকে বলা হয় পঞ্চতত্ব তাদের একজন এসেছিলেন।

বোরাকুলি গ্রামের উত্তর পাশ দিয়ে পশ্চিম পূর্ব দিকে বরাবর বয়ে গেছে মরা নদী। এখন এই নদীটির নাম মরা নদী হলেও, সুদূর অতীতে এর নাম ছিল গুমানি। নদিটির নাম গুমানি হওয়ার পিছনে কারণ হিসেবে শোনা যায়, এর বুকে ছিল অথৈ জলরাশি আর ভীষণ স্রোত। ফলে সর্বক্ষণ একটা গুমগুম, গোঁ-গোঁ আওয়াজ হত। এ থেকেই এর নামকরণ হয়েছিল গুমানি। তারপর কালক্রমে জল শুকিয়ে গেছে অর্থাৎ নদীটির মৃত্যু ঘটেছে। এজন্য এটাকে এখন মরা নদী বলা হয়ে থাকে। শোনা যায়, মোগল বাদশাদের আমলে এই গুমানির জলপথ বেয়ে বাণিজ্যতরী এবং সেনা জাহাজ যাওয়া আসা করত। পথমধ্যে বিশ্রামের জন্য বোরাকুলিতে তাঁরা নোঙর ফেলতেন। অবতরণ করতেন বোরাকুলির মাটিতে। স্বাভাবিক ভাবেই সে সময়ে এখানে দোকান পাট বা বাণিজ্য বন্দরী যে গড়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমেয়। কয়েক বছর আগেই নদীটিতে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে একটি বিরাট বটগাছের কঙ্কাল উঠেছিল। উঠেছিল একটি নৌকোও কেউ কেউ বলেন, নৌকোটিতে হাজার মণের বোঝা ছিল। যার গন্তব্যস্থান ছিল বাংলাদেশে।

গ্রামে যে মসজিদটি রয়েছে, বছর দশেক আগে তার ডান পাশের ছোটো ছোটো গর্ত থেকে গ্রামের মেয়েরা বাড়ি ছাঁচ দেবার জন্য কাঁখেব ছোট্ট ডালি ভরে মাটি খুঁড়ে নিয়ে যেত। খুঁড়তে খুঁড়তে সেখান থেকে তিনটি নরকঙ্কাল বেরিয়েছিল যাদের আকৃতি বর্তমান মানুষের থেকে প্রায় দ্বিগুণ লম্বা। মাথাও তেমনি বৃহৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমান, মোগল বাদশাদের প্রজা বা কর্মচারীদের কঙ্কাল ওগুলো। গ্রামের মানুষেরা সেগুলো মাটিচাপা দিয়ে দেন।

গ্রামটিতে বাবুর বাগান বলে একটি বাগান আজও রয়েছে। শোনা যায়, বাগানটি ছিল ইংরেজদের তখন বাগানটি ছিল বিশালকায় তাতে ছিল বিচিত্র রকমের ফলের গাছ আর ভয়ংকর জঙ্গল তাতে নাকি বাঘ-ভালুক থাকত। দেশ স্বাধীন হবার অনেক পরেও বাগানটির ভয়াবহতা অক্ষুন্ন ছিল আগের মতই। তবে এখন বাগানটির সেই শ্রী বা বাঘ ভালুক আর নেই। রয়ে গেছে শুধু নামটাই।

ছোটো বেলায় আমি যখন বাবা ও দাদাদের সঙ্গে গ্রামের জমিতে চাষ করতাম, তখন অনেক রকমের কড়ি, মরচে ধরা তামার পাত ও মুদ্রা, মাটির তৈরি আসবাবের খোলামকুচি প্রভৃতি খুঁজে পেতাম। অনেকেই বলতে শুনতাম, এখানে পাল, কুমোর প্রভৃতিদের বসবাস ছিল। ওগুলো তারই নিদর্শন। কিন্তু পরে তারা কবে কোথায় গেছেন বা তাদের কী হয়েছে, এসব কথা কেউই বলতে পারেন না।

ইতিহাসের এমনতর গন্ধজড়িত গল্প-কথা আর উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে বোরাকুলি গ্রামের মাটিতে। কিন্তু এগুলো উদাসীনতার শিকার। তাই অনেকেই জানেন না এসব। আগামিতে হয়তো অমূল্য কোনো হাতের ছোঁওয়ার প্রকাশ পাবে এসব।তখন উন্মোচিত হবে নতুন গল্প, নতুন চিত্র হয় আমরা .. জানতে পারব সে সব অজানা তথ্য।

নবাবী নওরোজ

নাফিসুন নিসা নাসির

২১ শে মার্চ পালন করে থাকে। নওরোজ হল ইরানের নববর্ষ। ইরানীরা ছাড়াও এই উৎসব প্রতিবছর এই উপমহাদেশেও পালন করা হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারেও যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে পালিত হয়ে আসছে এই নওরোজ উৎসব। এদিন প্রায় একশ রকমের খাবার বিশেষত বছরের নতুন ফল ও ফসল হজরত আলীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। হালুয়া সোন, দুধিয়া হালুয়া সোন পাপড়ি হালুয়া সোন গাজরের লজ, চুকান্দর লজ ডিমের লজ, গাজরের হালুয়া, হোলাপুরি, হোলা পরাঠা, বিরিয়ানী, কুলচা, খাতাই, জর্দা, শাহী টুকরা ইত্যাদি তৈরী করা হয়, সেদিন নওরোজ উপলক্ষ্যে। নিজামত ইমামবাড়ায় এই উৎসব প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে প্রতিবছর পালন করা হয়। একটা বড় দস্তার খান পেতে এই সব খাদ্য সামগ্রী সুন্দরভাবে সাজানো হয়। আর এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল একটা সুন্দর বাটিতে জল, জাফরান দিয়ে তার ওপর গোলাপ ফুল রাখা হয়। এর সাথে সাথে কোরান শরীফ রাখা হয়, এই বিশেষ বাটির সামনে। বহু প্রাচীন এই কোরান শরীফ সারা বছরে এই দিনই বের করা হয়। অন্য সময় বের করা হয়না। দস্তার খানায় হাত পাখা রাখা হয়। এরপর এই দিন থেকে, হাত পাখার ব্যবহার শুরু করা হয়। এরপরে সম্পূর্ণরূপে হজরত আলীকে নতুন ফল ও ফসল উৎসর্গ করা হয়। এই একই রকম অনুষ্ঠান পুরো নবাব পরিবারেও পালিত হয়।

মুর্শিদাবাদ গাইড

কার্ত্তিক ঘোষ - ৯৭৭৫৮৫৬৭০৫
গোপাল দাস - ৮১৪৫৩৩৪১৫০
লালচাঁদ মণ্ডল - ৮৯৬৭৪৫৫৯২০
বিশ্বজিৎ সিংহ রায় - ৯৬৪৭৩৩০৫৬৮

এনারা প্রত্যেকে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির স্বীকৃতি প্রাপ্ত গাইড। মুর্শিদাবাদ বেড়াতে এলে এঁদের সাথে যোগাযোগ করুন। এনারা আপনাদের সঠিক তথ্য তুলে ধরবেন।

নিখিলনাথ রায়ের ইতিহাস ও সাহিত্য চেতনা

—নুরজামান শাহ

সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সমগ্র ভারতবর্ষের বৈচিত্রময় ইতিহাসের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষত ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দের নবাবি আমলের পত্তন হওয়ার পর পলাশি যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ শক্তির উত্থান ইতিহাসের আমুল পরিবর্তন আসে, যা সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস নিয়ে প্রথম বই লেখেন গোয়াসের চৌকী মুনসেফী আদালতের মুনসেফ শ্যামধন মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটির অনেক পরে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস নিয়ে বই লেখেন নিখিলনাথ রায়। তাঁর লেখা 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' নামক বইটি আজও সর্বাধিক জনপ্রিয় বই বলে উল্লেখযোগ্য।

নিখিলনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পুড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম জানকীনাথ রায় এবং মাতা ছিলেন বসন্তকুমারী দেবী। তাঁর মাসিমা ছিলেন বহরমপুরের সেন পরিবারের বিশ্বম্ভর সেনের পত্নী। নিখিলনাথ রায়ের যখন দু'বছর বয়স তখন তাঁর পিতা মারা যান। পিতা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর মায়ের চেষ্টায় ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে পারিবারিক সূত্রে বহরমপুর চলে আসেন এবং খাগড়ার মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। নিখিলনাথ ছাত্রবস্থা থেকেই সাহিত্যের প্রতি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন। প্রথম কবিতা লেখার মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্যাঙগনে প্রবেশ। 'মুর্শিদাবাদ কথা' গ্রন্থের লেখক শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া নিখিলনাথ রায়ের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রবন্ধাবলী' এবং কাব্যের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্ত সংহার' ও 'কবিতাবলী' ছিল তাঁর প্রিয় বই। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাস এবং ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজ থেকে এফ.এ, ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ তারপর ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বি.এল পরীক্ষায় পাশ করেন। বি.এ ক্লাসে পড়াকালীন বহরমপুর কলেজের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। নিখিলনাথ রায় তাঁর শিক্ষাগুণ ও স্বাধীন অনুসন্ধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময়েই বহরমপুর কলেজের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বই পত্র পড়াশুনা করেন এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ড. রামদাস সেনের তৃতীয়া কন্যা সুরসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলে শ্বশুরমশাই -এর অত্যাশ্চর্য বইয়ের সংগ্রহশালা থেকেও প্রচুর বই পত্র পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ থেকে একটি বই লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বহরমপুর জর্জকোর্টে ওকালতি শুরু করলেও নিয়মিত ইতিহাস চর্চা চালিয়ে যেতেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন সম্পাদিত 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী', সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সৎসঙ্গ', কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সুধা', চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকায় নিয়মিত তিনি ইতিহাস বিষয়ক নিবন্ধ লিখতেন। এছাড়াও নব্যভারত, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকাতেও তাঁর লেখা প্রকাশ পেত। নিখিলনাথ রায়ের সমগ্র ইতিহাসচর্চার জীবনে শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল - 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৮৯৯) ও 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' (১৯০২) বই দুটি লেখা। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী'র উৎসাহে ও সাহায্যে 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' বইটি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র জনপ্রিয়তা সবার শীর্ষে। ২০ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট সম্বলিত এবং ৬৫০ পৃষ্ঠায় লেখা সুবৃহৎ এই বই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন - পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্মকোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত। ... তিনি সেই প্রাচীনকালকে খণ্ড খণ্ড চিত্র আকারে নিবন্ধ করিয়া পাঠকদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বই খানি যেন নবাবি আমলের ভগ্নাবশেষের অ্যালবাম। ... নিখিলবাবু এই সদ্‌দৃষ্টান্ত, তাঁহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ"। নিখিলনাথ রায় বহরমপুরে চার বছর ওকালতি করবার পর ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের চটিবালিয়াপুরের জমিদারী নায়েবী পদ লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চাকুরি ছেড়ে কলকাতায় আসেন। তিনি ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দ থেকে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রয়'র ঐতিহাসিক চিত্র' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৩২০ বঙ্গাব্দ 'শাশ্বতী' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এই পত্রিকাটিও চার বছর প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। বসিরহাট থেকেও ১৩২৪ থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'পল্লীবাণী' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।

নিখিলনাথ রায় গোঁড়া হিন্দু সমাজের মানুষ ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস, স্বধর্মে নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি অনুরাগ, ভগবানে ভক্তি, খাঁটি হিন্দুর আদর্শ চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। প্রাচীনপন্থী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শশধর তর্করত্ন চূড়ামণির তিনি মন্ত্র শিষ্য ছিলেন এবং শশধর চূড়ামণি প্রভাবিত বহরমপুরের 'সুনীতি সঞ্চারিণী' সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

নিখিলরায় রায় তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য এবং ইতিহাসচর্চার জীবনে অজস্র বই লিখেছেন। কবি, কবিতা এবং ইতিহাস সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা সর্বাধিক বেশি। তাঁর লেখা বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি হল — (১) রাজপুত কুসুম (১৮৪৮) (২) অশ্রুহার (কাব্য (১৮৮৬) (৩) ডাক্তার রামদাস সেন (১৮৮৬) (৪) মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৮৯৯) (৫) মুর্শিদাবাদ কায়স্থ সমিতি (১৯০২) (৬) মুর্শিদাবাদ ইতিহাস (১৯০২) (৭) সোনার বাঙগালা (১৯০৬) (৮) প্রাতাপাদিত্য (১৯০৬) (৯) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুক্রমণিকা ও পর্ব সংগ্রহ অধ্যায় (১৯০৭) (১০) ইতিহাস (১৯০৮) (১১) মরণ রহস্য (১৯১০) (১২) বরাই ডিসেম্বর (১৯১২) (১৩) কবি কথা ১ম খণ্ড (১৯১৫) (১৪) কবি কথা ২য় খণ্ড (১৯১৯) (১৫) চুণার (১৯১৯) (১৬) সমাধান (১৯২১) (১৯) জগৎশেঠ (১৯১২) (২০) পৃথ্বিরাদ্দরজ (১৯২৮)।

অমৃত্যুকালীন নিখিলনাথ রায় ইতিহাস চর্চায় মগ্ন থেকেছেন। অবশেষে ইতিহাস প্রাণ এই মানুষটি ১৯৩২ সালের ৪ নভেম্বর বেলা ৮ টা ৫মিনিট ৬৭ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

মুর্শিদাবাদের এক পুরানো জনপদ জিয়াগঞ্জের দেবীপুর

গোপাল মণ্ডল

পরের অংশ -

রাজার বংশধর আর কেউই ছিল না। তবে সুবেদাররা পরবর্তীতে এই সেনা ছাউনি থেকে সৈন্য ভাড়া দেওয়ার কাজ করতেন। সেনা ছাউনীকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। শোনা যায় যে, উদয়নালার যুদ্ধে এই দেবীপুর ছাউনীর সৈন্যরা ইংরেজদের হয়ে লড়াই করে খুব নাম কিনেছিলেন। ইংরেজরা খুব খুশি হয়েছিল।

আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ বাবু পূরণচাঁদ নাহার একখানি শিলালিপি থেকে রাজা গন্ধর্ব সিংহের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এ কথা পাঁচথুপীর ইতিহাসের সন্ধানী শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার গ্রন্থে বলেন।

আরও শোনা যায়, ভগীরথ মা গঙগাকে সাগরে নিয়ে যাবার পথে জিয়াগঞ্জ দেবীপুরে একদিনের জন্য বাস করেছিলেন। সেই সূত্রে পূর্ববঙগ থেকে অনেক জমিদার এই স্থানে গঙ্গাবাসের জন্য তাদের নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন, বানিয়েছিলেন দেবালয়, অতিথিশালা ও মন্দির দেবীপুরকে তারা করে তুলেছিলেন তীর্থকেন্দ্র। এখানে গড়ে উঠেছিল ছোট বড়ো আখড়া। ছোট দিগম্বর আখড়া এখনো আছে ভগ্নাদশায়। বড় আখড়াও আছে, আর আছে বিনোদের আখড়া। এছাড়া কিছু পুরোনো শিব মন্দিরও আছে পুরোনো শ্রীনিয়ে। দেবীপুরের গঙগাস্নানের ঘাটকে পূর্ববঙ্গের লোকেরা 'ভগীরথ গর্ত্ত' বলে বিশ্বাস করত। পূণ্যস্নানের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পুণ্যর্থীরা এই ঘাটে স্নান না করে দেশের বাড়ি ফিরে যেতেন না।

এই দেবীপুরে একটি দেখার মতো ইঁদারা আছে! এই ইঁদারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে নীচে থেকে একসময় জল তুলে আনা হত, যা এখনো ভগ্নাবস্থায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

আগে এই দেবীপুরে নাকি ২৫০০ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। ১২ খানি চতুষ্পাঠী ছিল! দুরদূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসত বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে! বিদ্যালাভের কেন্দ্র হিসেবে এই দেবীপুর ও বড়নগর ছিল পীঠস্থান। পাশাপাশি সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্রও ছিল এই দেবীপুর।

এই দেবীপুর গ্রামের চারপাশে ছিল মুর্শিদাবাদের নামকরা আম বাগান। এখন নমুনা দেখা যায় মাত্র। এখানকার আম রপ্তানি হত নানা জায়গায়। এছাড়া একদা বর্ষাকালে ইলিশ ও পোনা মাছের জন্য দেবীপুর প্রসিদ্ধ ছিল। নানা প্রান্ত থেকে খরিদ্দার আসতেন মাছের পোনা কিনতে। দেবীপুর লাগোয়া কাশীগঞ্জ হল জেলে মাঝিদের ঘাটি।

কালের গর্ভে কিছুই থাকে না। সব বিলীন হয়ে যায়। ততদিন ভাগীরথী দিয়েও অনেক জল বয়ে গেছে।

—সমাপ্ত—

নাবাব হুমায়ুন জাঁ'র গোসসা

ফারুক আব্দুল্লাহ

বাংলার মসনদে তখন নবাব নাজিম হুমায়ুন জাঁ। নবাবী কোন রকমে থেকে গেলেও নবাবের প্রভাব প্রতিপত্তি কমেছে বিস্তর। ইংরেজদের বিউগলের 'রুল ব্রিটানিয়া'র সুরে চাপা পড়ে গেছে নবাবী সানাই। এর মধ্যেই একদিন রেসিডেন্ট মারফত নবাব পেলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট খুব শ্রীঘ্রই মুর্শিদাবাদে আসছেন।

দিনটি ছিল ১৮২৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, গভর্নর জেনারেল প্রথমে জঙ্গীপুরে অবতরণ করবেন, এবং সেই মত সুতিতে তাকে সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে কোম্পানীর এজেন্ট সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের তদারকি করতে হাজির হয়েছেন সেখানে।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নবাব হুমায়ুন জাঁর যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তিনি বাধ্য হলেন যেতে। কারণ গভর্ণর জেনারেল সামান্য অসন্তোষে নবাবের ভাগ্যাকাশে ঘনাতে পারে দুর্যোগের কালো মেঘ। তাই নবাব একপ্রকার বাধ্য হয়েই জঙ্গীপুরে যাবার উদ্দেশ্যে ভাগীরথীতে নৌকা ভাসালেন। নাবব গন্তব্যে পৌঁছিয়ে শুনলেন গর্ভনর জেনারেল আসতে পারেননি কোন এক অজ্ঞাত কারণে। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খুব সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি মুর্শিদাবাদে যাবেন বলে দূত মারফত এজেন্টকে জানিয়েছেন।

গর্ভনর জেনারেল মুর্শিদাবাদে আগমনের সময় পিছিয়ে যাওয়ার কথা শুনে নবাব অধৈর্য হয়ে পড়লেন। কারণ গর্ভনর জেনারেল না আসা পর্যন্ত নবাবকে অনেকে জঙ্গীপুর শহরেই অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদ শহর ছেড়ে এতগুলো দিন জঙ্গীপুরে থাকার জন্য কিছুতেই রাজি হলেন না। আসলে মুর্শিদাবাদ শহর ছেড়ে এখানে থাকতে নবাবের মন কোন মতেই সায় দিচ্ছিল না।

এদিকে নবাবের আসার খবর পেয়ে এজেন্ট সাহেব এলেন নবাবের সাথে দেখা করতে। তিনি বোধহয় নবাবের বিরক্তির কিছুটা আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি নবাবকে চিঠি লিখে জানান যে, গর্ভনর জেনারেল অপেক্ষায় নবাবকে অযথা জঙ্গীপুর শহরে অবস্থান করতে হবে না। বরং তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে তার সাধকবাগের বাগানে যেন গর্ভনর জেনারেলের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেন। যাতে নবাবকে পুনরায় জঙ্গীপুরে আসতে না হয়।

নবাব এজেন্টের চিঠি পড়ে খুব রেগে যান, এবং রাগের মাথায় তিনি দিল্লি থেকে আনা তার নামাঙ্কিত একটি পাঞ্জা, দুটি সোনার মোহর ভর্তি বাক্স এবং একটি সোনার গয়না ভর্তি কাঁচের বাক্স নদীর জলে ফেলে দেন এবং বলতে থাকেন যে, তিনি গর্ভনর জেনারেল সাথে দেখা করতে কোন ভাবেই বাধ্য নন। যদি তাকে গর্ভনর জেনারেলের সাথে দেখা করতে বাধ্য করা হয়, তবে তিনি নিজেকে শেষ করে ফেলবেন। এতে করে যদি গভর্নর জেনারেল তাকে মসনদ থেকে সরিয়ে কাউকে নবাব করার ইচ্ছা পোষন করে থাকেন তবে তিনি তা করতে পারেন। এর পর একটি ছোট নৌকায় চড়ে নবাব হুমায়ুন জাঁ মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

তথ্য সূত্র ঃ

Letter of W.L. Melville to the persian Secretary to the Govt.
Dated September 18,1827

মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি কর্ত্তক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল।

স্থান ঃ হাজারদুয়ারী মিউজিয়াম প্যালেস, তারিখ - ১৮ এপ্রিল ২০১৯।

বিভাগ- ক	বিভাগ- খ	বিভাগ- গ
প্রথম : সায়নী মুখার্জী	প্রথম : শুভশ্রী সিংহ রায়	প্রথম : স্বর্ণপ্রভা বেহেরা
দ্বিতীয় : দেবাংশু বণিক	দ্বিতীয় : প্রমীত সাহা	দ্বিতীয় : স্নেহা শুকুল
তৃতীয় : জাহিরউদ্দিন চৌধুরী	তৃতীয় : নাইমা জাহান	তৃতীয় : অর্পিতা বিশ্বাস
চতুর্থ : সম্প্রীতি দাস	চতুর্থ : শ্রুতি ভট্টাচার্য	চতুর্থ : মহাম্মদ আসিকুল হক
পঞ্চম : শ্রীপর্ণা সাহা	পঞ্চম : সুমি খাতুন	পঞ্চম : রাতুল মুখার্জী
ষষ্ঠ : প্রিয়দর্শিনী বেহেরা	ষষ্ঠ : নবমিতা বিশ্বাস	ষষ্ঠ : রৌনক ঘোষ
সপ্তম : শ্রেয়া সাহা	সপ্তম : অরিত্র মজুমদার	সপ্তম : রোহন সূত্রধর
অষ্টম :অঙ্কুশ মোদক	অষ্টম : শ্রুতি রায়	অষ্টম : সূর্য্য হাজরা
নবম : প্রেম মণ্ডল	নবম : অত্রিশা কর্মকার	নবম : সায়ন দাস
দশম : আসমা আতিকা	দশম : সোমাশ্রী রায়	দশম : নবজিৎ বিশ্বাস

১৮ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ব ঐহিত্য দিবস উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগীতার বিশেষ মুহূর্ত। —হাজারদুয়ারী।

ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা সভায় উপস্থিত বাংলাদেশে ইতিহাসবিদ ও হেরিটেজ সদস্যরা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, সংবাদ প্রতিদিন, পুবের কলম, নাগরিক কণ্ঠ ও মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ সংবাদ পত্রিকার আমাদের মুখপত্র ইতিহাসের অলিন্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এর জন্য সংস্থার পক্ষে থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অভিভূত।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বাঁচানোর কাজে আপনারা যদি আমাদের সহযোগী হতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আমাদের হেরিটেজের সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্য সংস্থার সম্পাদক শ্রী স্বপন কুমার ভট্টাচার্য এর সাথে যোগাযোগ করুন আসুন আমরা সবাই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসি। ফোন - ৯৪৩৪০২১১৫৭

মুশিদাবাদে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত লেখা আমাদের পাঠান। এই নম্বরে - ৯৪৩৪০২১১৫৭

পরের অংশ —

ঐতিহাসিক মাদাপুর

কাজী হাসিব হাসান

একদা প্রসিদ্ধ জনপদ তথা কশবা মাদাপুর স্বাধীনত্তোর কালে ও ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কালে বাংলাদেশ থেকে আগত আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসত বাড়িতে পরিণত হয়েছে। এখানকার জমির মালিক ছিলেন খাগড়ার ডোমর চন্দ্র পোদ্দার। তিনি কাশিমবাজারের ওয়াকাফ এস্টেটের অধীনে মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর রায়াত বা প্রজা ছিলেন। তার সময় কালে মাদাপুরে এই আদিবাসী গ্রাম প্রতিষ্ঠার ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত Resident House জেলখানার ইট গ্রহ নির্মাণ ও কৃষি জমি সম্প্রসারণের ফলে তার অস্তিত্ব হারিয়েছে।

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মিরজাফরের সহায়তায় জয় লাভ করে। যুদ্ধ জয়ের পর লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ সালের ২৫ শে জুন থেকে মাদাপুরে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন, মিরজাফরের সহায়তায় জয় লাভ করে। যুদ্ধ জয়ের পর লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ সালের ২৫ শে জুন থেকে মাদাপুরে তিনদিন অবস্থান আটক, বিচার ও ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। রাজধানী মুর্শিদাবাদের 'মতিঝিল' থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল তাদের দপ্তরের কাজ চলতে থাকে। কিন্তু ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দরবারি রাজনীতি ও মতিঝিলের মধ্যে টানা পোড়েনের শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ কাউন্সিল তাদের দপ্তর মাদাপুরে স্থানান্তির করেন। ফলে মাদাপুরের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ১৭৬৭ সালে বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনের পূর্বে মাদাপুর ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদাপুরে Lord John Shore কিছু কাল বসবাস করেছিলেন। অন্যদিকে ১৭৭২ সালের ওয়ারেন হেস্টিং মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত করলে মাদাপুরে কাজকর্মে ভাটা পড়তে থাকে। মুর্শিদাবাদে ধীরে ধীরে মাদাপুরের জায়গা গ্রহণ করতে তাকে বহরমপুর ক্যান্টমেন্ট। এই ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নবাবি রাজনীতির সমস্ত ধরনের বিপদ তথা বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে দুর করা।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে একদিকে যেমন বহরমপুর শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি মাদাপুর তার গুরুত্ব হারায়। প্রশাসনিক কেন্দ্রের মর্যাদা হারালেও মাদাপুরের কুখ্যাত জেলখানা আরও প্রায় ১২০ বছর তথা ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজের প্রতিষ্ঠা ধরে রাখতে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য জেলখানা বন্ধ হলেও কোম্পানীর ও জেলখানাটি পরবর্তী কালে আরও কয়েক দশক নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতীক রূপে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মাদাপুরের উত্থান ঘটেছিল আকস্মিক ভাবে। পলাশীত্তর কালে মাদাপুর যেমন ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রধান দপ্তর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তেমনই কলকাতায় রাজাধানী স্থানান্তর ও বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের উত্থান মাদাপুরের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। একদা প্রসিদ্ধ শহরতলি তথা কশবা হলেও মাদাপুর বর্তমানে শুধু তার নাম টুকু ছাড়া আর কিছুই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ধরে রাখতে অসমর্থ হয়েছে। তবে ফাঁসি কাঠের মাঠ, ফাঁসি পুকুর ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ভিতের ইটগুলি এখন ইতিহাসের হাতছানি দেয়।

প্রথম পাতার পর

খেবুর অভিযান

জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। অতি দ্রুত মেরামত না হলে এই ঐতিহাসিক সৌধটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের ধারণা। পর্যটক ও ভ্রমন পিপাসু মানুষের সুবিধার জন্য জানাচ্ছি যাতায়াতের জন্য বহরমপুর থেকে সাগরদীঘি-রঘুনাথগঞ্জ রাজসড়কের 'যুগর' মোড়ে (৩৩ কিমি) নেমে টোটো গাড়ীতে ৪ কিমি অথবা এন.এইচ-৩৪ এর 'সেখদীঘি' স্টপেজে নেমে ৬ কিমি যে কোন গাড়িতে গেলেই ঐতিহাসিক খেবুর মসজিদটির দেখা মিলবে। এই ঐতিহাসিক সৌধটি রক্ষার্থে অতি দ্রুত মেরামত সহ সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

পরের অংশ —

মুর্শিদাবাদের ডাকাত কালী

সনাতন দাস

রঘু ডাকাত স্বপ্নাদেশ পেলেন তার অরাধ্য দেবী মা'কালী আদেশ করেছেন 'এ আমার পুত্র আজ ডাকাতি করতে যাবি না, আজ তুই সফল হতে পারিবিনা।'

মাকালী স্বপ্নে আরো বললেন 'যদি আজ ডাকাতি করতে যাস তা হলে তুই আমাকে ফিরে এসে দেখতে পারি না।' সেই দিন রঘু ডাকাত মনে মনে আঁকলেন (ভবলেন) আমি হচ্ছি ডাকাত। তার উপর মাকালীর ভক্ত। আমার আবার কিসের বিপদ। এইরূপ ভেবে স্বপ্নাদেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সদলবলে ডাকাতি করতে বেরিয়ে পড়লেন। ঘনিয়ে এলো বিপদ, রঘু ডাকাতের দল ধরা পড়ে গেলো। রঘু ডাকাতের মাথায় বজ্রঘাত, মনে পড়লো অরাধ্য দেবীর স্বপ্নে বলার কথা। ছদ্মবেশ ধারণ করে কোন প্রকারে জীবন রক্ষাকরে খালি হাতে ফিরে এলেন আখড়াতে। এসেই দেখলেন আরেক দৃশ্য তার ইষ্টবেবীর মন্দির শূন্য হয়ে পড়ে আছে।

এখানো আরো একটি জনশ্রুতি আছে। রঘু ডাকাত সেদিন বিফল মনোরথ হয়ে আস্তানায় ফিরে এসে রাগে আগুন হয়ে হাতে খড়্গ (খর্গ) উঠিয়ে মা কালী মন্দিরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই বলে ''সারাজীবন তোর পূজা করলাম আজ তুই আমাকে ধরিয়ে দিলি, তোর কারণে ধরাপড়লাম আজ তোর রেহাই নাই।'' এই রঘু ডাকাতের ক্রোধ ও হাতের খড়্গ দেখে এবং শালীনতা হীন কথাবার্তা শুনে মাকালী রেগে গিয়ে 'তোর এখানে আর থাকবো না' এই বলে মাকালী মন্দিরে সম্মুখে একটি কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই থেকে নশিপুর জঙ্গালী /ডাকাত কালী বাড়ীতে মাতৃমূর্তি ছাড়াই, মা কালীর পদচিহ্নের পূজা করা হয়। বর্তমান অবস্থায় সেটাই হচ্ছে। এখানে আরো একটি জনশ্রুতি আছে। চলুন দেখি কি প্রচলিত আছে সেই জনশ্রুতি।

চলবে

লালগোলা রহমাতুল্লা : শতবর্ষের এক সংগ্রামী অজানা ইতিহাস

দুরুল ইসলাম

ইতিহাস চর্চিত ১৯১৯ সালে এক ক্ষুদ্র জনবসতি এলাকা লালগোলায় মৌঃ আব্দুল আজিজ ওরফে পাঁড়ে মৌলভি প্রতিষ্ঠা করেন ''লালগোলা রহমাতুল্লা হাই মাদ্রাসা''। উত্তর প্রদেশের শাহরানপুর থেকে শিক্ষা শেষ করে তিনি লালগোলায় ফিরে এসে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। মৌলানার চিন্তাকে বাস্তব রূপদানের জন্য লালগোলার ভূমিপুত্র দানশীল মহারাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় তাকে রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা দান করে দেন। এখানেই এক কুড়ে ঘরে নিউস্কীম মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লালগোলা জুনিয়র মাদ্রাসা' নামে পথ চলা শুরু।

১৯২৬-২৭ খ্রিঃ অষ্টম শ্রেণী, ১৯৪৪ খ্রিঃ নবম শ্রেণী ও ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দশম শ্রেণির পঠন চালু করে একে হাই মাদ্রাসায় উন্নতি করা হয়। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারি ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের স্বীকৃতি পেয়ে একটি লালগোলা হাই মাদ্রাসায় রূপান্তরীত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫১ খ্রিঃ 'পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ' কর্তৃক এটি স্বীকৃতি লাভ করে। এক্ষেত্রে তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক রহমাতুল্লা সাহেবের মহৎ অবদানকে স্মরনে রাখার জন্য আজিজ সাহেব এর নাম করেন 'লালগোলা রহমাতুল্লা হাই মাদ্রাসা'।

মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ন জমি দান করলেও এই শিক্ষাঙ্গনের সামনে অনেক সমস্যা ছিল। আর্থিক সংকট, ছাত্র-শিক্ষক সংকট ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কিন্তু পাঁড়ে সাহেব পা ও সাইকেল সমস্ত লালগোলা চত্বর ভ্রমণ করে অর্থ ও ছাত্র সংকট দূর করেন। দেশ ভাগের পর পুনরায় সংকট দেখা দিলে সাজাদ সাহেবের নেতৃত্বে তার উত্তরণ ঘটে। এর ফলে তিনি সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সঙ্গবুর সাহেব। দীর্ঘ বঞ্চনার পর ২০০৯ খ্রিঃ 'পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল' এই শিক্ষারূপকে এইচ.এস এর মর্যাদা দান করে। লেখার আরও অনেক ছিল, কিন্তু এখানেই শেষ করছি।

তথ্য ঃ

১। শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা
২। আনন্দ বাজার পত্রিকা - ২০১৭

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। মোঃ জাকির হোসেন - বর্তমান শিক্ষক
২। ইজাজ আহমেদ - প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন বিডি আর বাংলাদেশ।

সিটি মুর্শিদাবাদ ব্যবসায়ী সমিতি পরিচালিত

মুর্শিদাবাদ পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র (একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা) মুর্শিদাবাদে বেড়াতে আসা পর্যটকদের সহযোগীতা করা হয়, ব্রিজ ঘাটের সামনে, হাজারদুয়ারীর বিপরীতে।

পোঃ ও জেলা - মুর্শিদাবাদ

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪০২১১৫৭

দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিতে ইতিহাসের অলিন্দের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের খবর

লেখকের বক্তব্য নিজস্ব ঃ এর জন্য মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি কোন ভাবে দায়ী নন।

প্রকাশক ঃ স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য (৯৪৩৪০২১১৫৭), মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক - ফারুক আব্দুল্লাহ্ (৯৪৩৬৪৪০৮৯), সহ-সম্পাদিকা - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), সম্পাদক মণ্ডলী - অপূর্ব কুমার সেন, স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য, অর্ণব রায়। প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী

West Bengal and Printed from M/s. Kis Digital Colour Lab, 27, Maharaja Srish Ch. Nandi